E Marks

① শ্যামাসুন্দরী-চরিত্রের-গুরুত্বঃ-

জন্যই- কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বিকাশ ও কাহিনীর পরিণতির অন্যতম উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরী চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল। ননদিনী শ্যামাসুন্দরী ও ভ্রাতৃবধূ মৃন্ময়ীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আমরা একদিকে যেমন সুখী কপালকুণ্ডলার পরিচয় পাই, তেমনি সুখী জীবন যে তার সুখ নেই, সেকথাও জানতে পারি। শ্যামাসুন্দরী- স্নেহপরায়ণা, সুরসিকা। কিন্তু- তৎকালের সমাজের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে- কুলীন স্বামীর পত্নী রূপে এই বিরহ-ভাগিনী মেয়েটির মনোদুঃখের কথাও আমরা জানতে- পারি। শ্যামাসুন্দরী স্বামীর ভালোবাসা পেতে চায়, তা না পেয়ে ঔষধ করতে চায়, আর সেই ঔষধ করার উপকরণ সংগ্রহ- করতে গিয়েই কপালকুণ্ডলার জীবন বিপর্যয় ডেকে আনে। তবে, সমাজের ও শ্যামাসুন্দরীর দোষ নয়, তাই কপালকুণ্ডলার মধ্যে নারীর চিরন্তন প্রত্যাশাগুলোর ২৬ কথা তুলে সে যেমন জাগিয়ে দিয়েছে তেমনি নারীর মর্যাদা, ভালোবাসা থেকে সে বঞ্চিত ছিল ঔষধ সংগ্রহে যেতে চায় না। এক দুর্ভাগ্যজনিত কুলীন পত্নী রূপে শ্যামা- = সুন্দরীর চরিত্রটি এই রোমান্স কাহিনীটির মধ্যে বাস্তবের সমাবেশ ঘটিয়ে তুলে ধরেছে।

—x—

২i

② মেহেরুন্নিসা চরিত্রের গুরুত্বঃ-

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মেহেরুন্নিসা। এই চরিত্রটি ঐতিহাসিক। ১০ মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানেরই পূর্ব নাম মেহেরুন্নিসা। প্রথম জীবনে সে ছিল বর্ধমানের শাসনকর্তা- শের-আফগানের পত্নী। তবে এই ঐতিহাসিক নারী চরিত্রটিকে বঙ্কিম এখানে অনৈতিহাসিক লুৎফউন্নিসার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী- চরিত্র রূপে দাঁড় করিয়েছেন। সেলিমের প্রতি মেহেরুন্নিসার ভালোবাসা প্রবল, একথা জানতে পেরে লুৎফুন্নিসার- হৃদয় আরও বেশি করে পূর্ব স্বামী নবকুমারের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। মেহেরুন্নিসার আত্মসংযমতাতেও, স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ, সেইসঙ্গে কুমার সেলিমের প্রতি ভালোবাসা, এই সব মিলিয়ে লেখক তার চরিত্র- মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

—x—

③ কাপালিক চরিত্রের গুরুত্বঃ-

কপালকুণ্ডলা যদি আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র হয়, তবে এই চরিত্রের মুক্তস্বভাব ও নির্লিপ্তত হল কাপালিক চরিত্র সমুদ্রতীরে পরিত্যক্তা কপালকুণ্ডলাকে তান্ত্রিক যোগসিদ্ধির প্রয়োজনেই কাপালিক মানুষ করেছিল. অর্থাৎ তার চরিত্রে ও কাপালিক, তন্ত্রসাধনায় মোক্ষলাভই এই কাপালিকের উদ্দেশ্য. তাই নবকুমারকেও সে দেবীর চরণে বলি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেসময় দৈব ছিল কাপালিকের প্রতিকূল. তাই কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারকে খুঁজতে গিয়ে উচ্চ-বালিয়াড়ি থেকে পড়ে তার হস্তপদ ভগ্ন হয়েছিল. কপালকুণ্ডলাকে সে দেবীর চরণে-অপরাধী-পাপিষ্ঠার মত মনে করে তাকে খুঁজতে সে নবকুমারের গৃহের সন্নিকটবর্তী অরণ্যে আশ্রয় নেয়. কপালকুণ্ডলার প্রাণহননই তখন তার উদ্দেশ্য ছিল. এর জন্য-লুৎফউন্নিসা বা পদ্মাবতীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু-লুৎফউন্নিসাকে দিয়ে কাপালিকের স্বার্থসিদ্ধি-হল না. কারণ কপালকুণ্ডলার হত্যায় লুৎফউন্নিসার মত ছিল না. তখন দুর্বলচিত্ত, সন্দেহপ্রবণ নবকুমারের মনে কাপালিক স্ত্রী কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে আরও ক্রোধ অন্তরে জাগিয়ে তোলেন. এইভাবেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত নবকুমারের সঙ্গে কাপালিকের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে যে কাহিনীর সূচনা, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার-জীবনের সমাপ্তিতে প্রবল হিংস্র কাপালিকের মধ্য দিয়ে কাপালিক, কাহিনী-পরিসমাপ্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

—x—

④ অধিকারী চরিত্রের গুরুত্বঃ-

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে স্বল্পসময়ের জন্য এলেও অধিকারী-চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অধিকারী কাপালিকের বিপরীতধর্মী চরিত্র। তারা উভয়েই মাতৃসাধক। কিন্তু কাপালিক যেখানে ভয়ংকর, রুদ্র, তন্ত্রসাধক, অধিকারী সেখানে কোমলপ্রাণ, স্নেহবৎসল, কাপালিক আপনার সাধনাসিদ্ধির জন্য কপালকুণ্ডলাকে বড় করে, তার সাধনার অন্যতম অঙ্গ নরবলি, আর অধিকারী কপালকুণ্ডলার প্রতি স্নেহপ্রবণ, তাকে সে 'মা' বলে ডাকে। কপালকুণ্ডলার নিরাপত্তার কথা ভেবে সে নবকুমারের সঙ্গে তার বিবাহের আয়োজন করে। নির্জনবাসী হলেও অধিকারী সমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে সচেতন। তাই বিবাহের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বলে - "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান।" অধিকারী একান্তভাবে বাস্তববাদী ভীষণ দূরদর্শী ছিল। তাই সংকটকালে সে নবকুমারের কাছে কপালকুণ্ডলার বিবাহ প্রস্তাব করেছিলেন, অবশ্য যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা প্রদত্ত বিল্বপত্রটি দেবীর চরণচ্যুত হওয়ায় অধিকারী বিষণ্ণ হয়ে ছিল। কিন্তু - স্বামী যদি শ্মশান-বাসী হয় তবু তাকে অনুসরণ করাই স্ত্রীর ধর্ম। এই বলে অধিকারী বিষণ্ণ মনে কপালকুণ্ডলাকে বিদায় দিল, যাবার আগে তাকে কিছু অর্থও দিল। 'এভাবে' স্বল্পসময়ের মধ্যেই অধিকারীর স্নেহপ্রবণ মানবিক দিকটির উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক।

—x—

Scanned with CamScanner